এডেলেইডে সাতদিন

প্রদীপ দেব

০৫

সকালে দুটো প্লেনারী সেশান ছাড়া সারাদিন আর কোন একাডেমিক প্রোগ্রাম নেই আজ। দিনটা ফ্রি রাখা হয়েছে এডেলেইড ঘুরে দেখার জন্য। কন্‌ফারেনস থেকে পাঁচটি ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মধ্যে তিনটি হলো ওয়াইনারি ট্যুর; মদ কীভাবে তৈরি করা হয় দেখার জন্য আঙুর ক্ষেত পরিদর্শন আর সাথে মদের ফ্যাক্টরি। বিনে পয়সায় মদ চেখে দেখার সুযোগ দেয়া হবে সেখানে। কনফারেনসের বেশির ভাগ ডেলিগেট যাচ্ছে সেখানে বিনে পয়সায় মদ খাবার লোভে। আর একটি ট্যুর হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর। আর শেষ ট্যুরটি হলো ক্লেল্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুর। আমি যাচ্ছি ওয়াইল্ড লাইফ দেখতে।

দুপুর একটায় আমাদের যাত্রা শুরু করার কথা। ভিক্টোরিয়া ড্রাইভের নির্দিষ্ট পয়েন্টে গিয়ে দেখলাম আমি সহ মোট তিনজন যাচ্ছি ওয়াইল্ড লাইফ দেখতে। গাইড ভদ্রমহিলা হ্যান্ডশেক করে অভ্যর্থনা জানালেন। মোট চারজন ডেলিগেটের যাবার কথা। রমেন নামক চতুর্থ জনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এবং নানা জায়গায় রমেনের খোঁজ করতে করতে অনেক সময় চলে গেলো। কিন্তু রমেনের দেখা পাওয়া গেলো না। শেষে রমেনকে ছাড়াই রওনা দিলাম আমরা। মাইক্রোবাসে।

পরিচয় হলো অপর দুজনের সাথে। একজন জুয়ান। জুয়ান ইউরিবাস্‌টেরা। সুইডিশ। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে একবছরের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এসেছে। পৃথিবীর অনেক দেশের ইউনিভার্সিটির সাথে অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটির এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আছে। বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা তাদের কোর্সের একটা বা দুটো সেমিস্টার এদেশের ইউনিভার্সিটিতে এসে পড়ে যায়, পরে ক্রেডিট ট্রানসফার করা হয় মূল ইউনিভার্সিটিতে। জুয়ান এখনো জোয়ান, কিন্তু মাথায় এর মধ্যেই টাক চক চক করছে। অন্যজনের নাম লং সং। ছিপছিপে পাতলা চায়নিজ। লা ট্রোব ইউনিভার্সিটির ছাত্র। মেলবোর্নের বান্দুরা ক্যাম্পাসে তার অবস্থান। লং সং এর মুখে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। হাসতেই ময়লা দাঁত বেরিয়ে পড়লো। মনে হলো, না হাসলেই তাকে ভালো লাগে।

আমাদের গাইডের নাম ডায়না। ডায়না বললে যে ধরণের চেহারার কথা মনে হয় তার সাথে আমাদের এই ডায়নার কোন মিল নেই। ইনি খর্বাকৃতি, স্থূলাঙ্গী ও প্রবীণা। ডায়না এডেলেইড সিটির কয়েকটা রাস্তা ঘুরিয়ে দেখালেন আর বললেন এডেলেইডের ইতিহাস যার কিছুটা আমরা ইতোমধ্যে জানি। শহরটা এক চক্কর দিয়ে আমাদের নিয়ে এলেন বাস স্টেশানে। বললেন,

- যেহেতু তোমরা মাত্র তিনজন, সেহেতু আমি তোমাদের একটি ট্যুরিস্ট বাসে তুলে দেবো। তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। সব পয়েন্টে তোমাদের নাম দেয়া আছে। পার্কের রেস্টুরেন্টে তোমাদের যা খুশি মন চায় ফ্রি খেতে পারবে।

এডেলেইড ডে ট্যুর অফিসের লিজার হাতে আমাদের গছিয়ে দিয়ে এবং লিজা আমাদের দেখাশুনা করবে একথা বার বার বলে ডায়না অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আগুনের মতো সুন্দরী লিজা আমাদের সাথে যাবে, পাশে পাশে ঘুরবে এরকম একটা আশায় আমরা খুশি হয়ে গেলাম। জুয়ান তো পারলে এখুনি ছবি তুলতে শুরু করে। লিজা আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। আমাদের মনের অবস্থা সে ঠিকই বুঝতে পারছে। ট্যুরিজমে কাজ করতে করতে এটুকু অভিজ্ঞতা তার নিশ্চয় হয়েছে। সে মিটিমিটি হাসতে হাসতে আমাদের ইতিহাস জেনে নিচ্ছে। এডেলেইড কেমন লাগছে, ক'দিন আছি ইত্যাদি। বেচারা লং সং প্রাণপণ চেষ্টা করছে ইংরেজি বাক্য বানাতে, কিন্তু তোতলাতে তোতলাতে কী বলছে তা লিজা কেন আমিও বুঝতে পারছিনা।

ট্যুরিস্টবাস এসে গেছে। লিজা আমাদের তিনজনকে নিয়ে বাসে উঠে পড়লো। বাসে খুব বেশি ভীড় নেই। লিজা ড্রাইভারের সাথে কথা বলছে আর আমরা তিনজনই তিনটি আলাদা সিটে বসে প্রত্যেকেই আশা করছি লিজা এসে পাশে বসবে। একটু পরে লিজা হাসিমুখে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে।
- হ্যাভ আ নাইস টাইম গাইস্।
বলে হাসি মুখে নেমে গেলো লিজা। ড্রাইভার বাস ছেড়ে দিলো। চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেলো লিজা। আমাদের তিনজনেরই অবস্থা চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো। জুয়ানের মুখের দিকে তাকাতেই সে দার্শনিক হয়ে পড়লো। বললো,
- লিজা আর লিজার্ডের মধ্যে পার্থক্য নেই মোটেও। দুটোই রক্তচোষা।

লিজার শোক কাটিয়ে উঠতে সময় লাগলো না। বাসে বিশ পঁচিশ জনের একটা ট্যুরিস্ট গ্রুপ। সবাই যে এডেলেইডে নতুন তা বোঝা যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে চমৎকার সব গাছের সারি, যা অস্ট্রেলিয়ার সব জনপদেই প্রায় একই রকম। ড্রাইভার মাইক্রোফোনে সবকিছুর একটা পরিচিতি দেবার চেষ্টা করছে।

আমি ভাবছি প্রকৃতি তার প্রাকৃতিক পোশাকেই বেশি সুন্দর নাকি তারও সামান্য রূপচর্চার প্রয়োজন আছে? যেমন এখানে সুন্দরী প্রকৃতিকে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে এরা। গাড়ি আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে এঁকে বেঁকে। প্রায় দুতিনশ মিটার উঁচুতো হবেই। নিচের এডেলেইড ক্রমে ছোট হয়ে আসছে। এই পাহাড়েই দেখা গেলো টেলিভিশন চ্যানেল গুলোর সম্প্রচার টাওয়ারগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আরো উপরে উঠে যাচ্ছি এখন। ড্রাইভার বলে চলেছে ডানদিকের গাছে গাছে কোয়ালা থাকে এখানে। আমরা গাছের শাখা প্রশাখা দেখতে দেখতে ঘাড় ব্যথা করে ফেললাম, কিন্তু কোয়ালার দেখা পেলাম না।

বিশাল পাহাড়ি এলাকা জুড়ে এই ক্লেল্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক। চিড়িয়াখানার মতো। তবে

সংরক্ষিত প্রাণীগুলো অনেকটা স্বাধীন আর অহিংস। ড্রাইভার পার্কের রিসেপ্শানে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বাস নিয়ে চলে গেলো। পৌনে পাঁচটায় এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবে। হাতে প্রায় তিন ঘন্টা সময় পাওয়া গেলো।

পার্কে ঢুকতেই একটা ঝোপের মতো জায়গা। চারপাশে একমিটার উঁচু দেয়াল দিয়ে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখা হয়েছে ঝোপটি। তাসমেনিয়ান ডেভিলের বাসা। কুচকুচে কালো এই প্রাণীটি দেখতে অনেকটা ইঁদুর আর শেয়ালের চেহারার মিশ্রণ। এর পাশেই বিশাল বিশাল ইউক্যালিপ্টাস গাছের নিচে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্যাঙারুর দল। অস্ট্রেলিয়ায় মোট ক্যাঙারুর সংখ্যা নাকি পাঁচ কোটির বেশি। অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি। ক্যাঙারু পরিবারের সব বয়সী সদস্যরাই আছে এখানে। ছবি তোলা যায় সহজেই। ক্যাঙারুর সাথে নিজের একটা ছবি তোলার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়ে আছে এখানে। হাতে ক্যাঙারুর জন্য খাবার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যাঙারুর আশে পাশে। ক্যাঙারুর খাবার এক প্যাকেট এক ডলার করে বিক্রি হচ্ছে কাউন্টারে। আমি কোন খাবার কিনিনি। কিন্তু তাতে কি? ট্যুর গ্রুপের সাথে আসা কিশোরী ক্যারোলিনের সাথে আলাপ হয়ে গেলো ক্যাঙারু বিষয়ে কথা বলতে বলতে। ক্যারোলিন আমাদের বাসেই এসেছে এখানে। তাদের পুরো পরিবারই এসেছে। তারা নিউজিল্যান্ডের মানুষ। ক্যারোলিনের সাথে ক্যাঙারু পর্যবেক্ষণ করলাম কিছুক্ষণ। ক্যাঙারু যখন দাঁড়ায় তখন তার মূল ভরকেন্দ্র চলে যায় তার লেজে। মূলত লেজ দিয়েই ক্যাঙারু দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। দৌড়ানোর সময় সামনের দু'টো পা মাটিতে লাগে না। লাফিয়ে লাফিয়েই দৌড়ায় ক্যাঙারু। তাদের পেছনের দুই পায়ের দৈর্ঘ্য সামনের দুই পায়ের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণেরও বেশি। বিভিন্ন প্রজাতির ক্যাঙারু দেখলাম। কিছু ক্যাঙারু থাকে পাথুরে জায়গায়। আবার কিছু থাকে ঝোপের মধ্যে। উটপাখি দেখলাম অনেকগুলো। কৃত্রিম লেকে প্রচুর হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেশের পাতিহাঁসের মতোই। এখানে চরে বেড়াচ্ছে বলেই হয়তো দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পাখি আছে কিছু, তা খুব একটা মাতামাতি করার মতো আহামরি কিছু নয়।

অস্ট্রেলিয়ান ডিঙ্গু দেখলাম দুটো। একটা নিরাপদ বেষ্টনী ঘেরা জায়গায় রাখা আছে তাদের। কুকুর আর ডিঙ্গুর চেহারায় তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে ডিঙ্গু হলো ভয়ংকর। লাফ দিয়ে গলা কামড়ে ধরে বলে শুনেছি। আর কুকুরের সাথে বেসিক পার্থক্য হলো ডিঙ্গু কখনো ঘেউ ঘেউ করে না। ডিঙ্গুর পরিচর্যাকারী মহা উৎসাহে ডিঙ্গু মাহাত্ম্য প্রচার করছে। শোনার ধৈর্য হলো না। চলে গেলাম আরো ভেতরের দিকে। ঝোঁপের মধ্যে দেখা গেলো খরগোস সাইজের কিছু ইঁদুর। কুচকুচে কালো। এদের অফিসিয়াল নাম হলো ব্যান্ডিকুট্স।

পার্কের মাঝখানে কোয়ালার বসতি। ভালুক টাইপের এই প্রাণীটি বড় বেশি অলস। মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে অলস প্রাণী। সারাক্ষণই ঘুমায়। যেখানেই বসাও, ঘুমিয়ে পড়ে। কোলে নিলে তো কথাই নেই। ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতা হলো কোয়ালার একমাত্র খাদ্য। ইউক্যালিপ্টাস পাতা বিষাক্ত। কিন্তু কোয়ালা এই বিষ হজম করতে পারে। কীভাবে পারে কে জানে। এখানে কোয়ালাকে কোলে নিয়ে ছবি তোলার জন্য লম্বা লাইন। কোয়ালার তত্ত্বাবধান করছে একটা মেয়ে। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। সে একের পর এক জনের কাঁধে তুলে

দিচ্ছে একটা নাদুস নুদুস কোয়ালা। আর ক্লিক ক্লিক করে ছবি তুলে দিচ্ছে সঙ্গী সাথীরা। পার্কের নিজস্ব ফটোগ্রাফারও আছে টাকার বিনিময়ে ছবি তুলে দেবার জন্য।

একটা ছোট্ট ঘরে বড় বড় কাচের বাক্সে বেশ কিছু সাপ রাখা আছে। মোটামুটি সুলভ প্রজাতির সাপ। কিছু বিষাক্ত, কিছু নির্বিষ। অস্ট্রেলিয়ায় বেশ বিষাক্ত সাপ আছে বিশেষ করে মরু অঞ্চলে। জুয়ান বলছিলো সুইডেনের সাপের কথা। সুইডেনের সবচেয়ে বিষাক্ত সাপের কামড়ে নাকি বড়জোর একটা ফোসকা পড়তে পারে। গত পঁচিশ বছরে সুইডেনে সাপের কামড়ে মারা গেছে মাত্র একজন লোক। তাও সাপের বিষে এলার্জির কারণে। লোকটার নাকি সাংঘাতিক রকমের এলার্জি ছিলো। কিছু গুঁইসাপ দেখা গেলো এক কোণায় জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে। চট্টগ্রাম শাহীন কলেজে কাজ করার সময় আমি এরচেয়ে বড় গুঁইসাপ কলেজের বারান্দায় দেখেছি। এখানে এর চেয়ে বড় গুঁইসাপ কি পাওয়া যায় না?

ওয়াইল্ড লাইফ পার্কে ঠিক কোনটাকে ওয়াইল্ড বলবো বুঝতে পারছিনা। এখানে কোন কিছুকেই সেই অর্থে ওয়াইল্ড মনে হলো না। পার্ক দেখা শেষ। রিফ্রেশমেন্ট সেন্টারে গিয়ে আমাদের কার্ড দেখানোর সাথে সাথে কাউন্টারের তরুণী জানালো আমরা যা কিছু খেতে চাই সব ফ্রি। সব? অস্ট্রেলিয়ান তরুণী চোখেমুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে ভ্রু নাচিয়ে বললো,
- এবসলিউটলি এভ্রিথিং হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট।
অস্ট্রেলিয়ায় বারে বা রেস্টুরেন্টে কাজ করে এরকম অনেক ছেলেমেয়ে সুযোগ বুঝে আদিরসাত্মক রসিকতা করতে পছন্দ করে। এধরণের রসিকতার পরের স্তরে পৌঁছানোর মত সাহস আমাদের কারোরই নেই। আমরা হাসতে হাসতে খাদ্য বাছাই করতে লাগলাম। আমি একটা হটডগ আর কোকাকোলা, লং সং দু'টো বীয়ার আর জুয়ান একটা অরেঞ্জ জুস নিলো। এই হলো আমাদের এভ্রিথিং এর দৌড়।

ফেরার পথে আবার এডেলেইড সিটির রাস্তায় ঘোরা হলো বাস ড্রাইভারের ধারাবিবরণীর সাথে সাথে। ড্রাইভার জানালো আমরা যদি বীচে যেতে চাই আমাদের নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আসার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের। এই বীচের কথাই বলছিলো জিন। চলে গেলাম বীচে।

এডেলেইড সিটি থেকে দশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্লেনেল বীচ। চমৎকার সাজানো গোছানো স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি বীচটাউন। ইউরোপীয় অভিবাসীরা এখানেই প্রথম নোঙর ফেলেছিলো ১৮৩৬ সালে। যে কর্নেল লাইট এডেলেইড সিটির স্থান নির্বাচন করেছিলেন তিনিও শুরুতে এখানেই এসেছিলেন। বিস্তীর্ণ বালুচর। শতশত নারীপুরুষ বালিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে এই প্রচন্ড রোদে। সানবাথ। অনেকেই সম্পূর্ণ নগ্ন। রোদেপুড়ে বাদামী হবার বিপজ্জনক চেষ্টা। অস্ট্রেলিয়ায় স্কিন ক্যানসারের হার পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি। প্রতি চৌদ্দজন অস্ট্রেলিয়ানের মধ্যে একজন স্কিন ক্যানসারে ভুগছে। নিজে কালো হবার সান্ত্বনা এখানেই। ঠান্ডার দেশের মানুষ জুয়ান। তার হাতের চামড়ায় ফোসকা পড়ে গেছে মাত্র দুদিনের রোদে। লং সং কে নিয়ে নতুন বিপদ দেখা দিলো এখানে। কোন মেয়ে নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে দেখলেই সে হা করে তাকিয়ে থাকছে সেদিকে। এভাবে তাকিয়ে থাকাটা আইনত নিষিদ্ধ না হলেও

কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে আমাদেরই।

রাত নয়টার দিকে চলে এলাম সিটিতে। ট্রামে চড়ে। এডেলেইডের একমাত্র ট্রাম বীচ থেকে সিটির ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার পর্যন্ত যাতায়াত করে। ভিক্টোরিয়া স্কোয়ারটা খুব সুন্দর। চমৎকার একটা ফোয়ারা এর মূল আকর্ষণ। রাতের হলুদ বাতিতে ঝর্নাটাকে চমৎকার দেখাচ্ছিলো। তিনটি পাথরের মূর্তির মাথা থেকে তিনদিক দিয়ে পানি ঝরে পড়ছে। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার তিনটি নদী টরেন্স, ওঙ্কাপারিঙ্গা আর মারী। নদী তিনটির প্রতীকী সংস্করণ এই মূর্তি তিনটি। চর্মসার মানুষরূপী এই নদীমূর্তি দেখলে জয়নূলের আঁকা দুর্ভিক্ষের ছবি মনে পড়ে।

জুয়ানকে এডেলেইড রীজ হোটেলে এগিয়ে দিয়ে আমি আর লং সং হোস্টেলে ফিরে এলাম। লং সং থাকে এগারো তলায়।